অন্যকথা

সম্প্রতি আমরা হারালাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক প্রগাঢ় অনুরাগী পাঠক তথা গবেষককে। না, তিনি কোনও বঙ্গভাষী নন, এমনকি নন ভারতীয়। পশ্চিম গোলার্ধের বাসিন্দা হয়েও বাংলা সাহিত্যে অপরিসীম প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তির অধিকারী এই মানুষটির নাম উইলিয়াম রাদিচে। বিশেষ করে রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে তাঁর কাজ রসিকমহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। পেশাগত জীবনে অধ্যাপক হলেও রাদিচে ছিলেন মূলত একজন কবি। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা নয়। ১৯৮৫-তে পেঙ্গুইন বুকস থেকে প্রকাশ পেলো তাঁর রবীন্দ্র কবিতার ইংরেজি অনুবাদ 'সিলেক্টেড পোয়েমস' যা আদতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার ফসল। এখানেই থামলেন না রাদিচে। আরও বেশ কিছু রচনার ইংরেজি অনুবাদ আমরা পেলাম যার মধ্যে ছিল গল্পের অনুবাদ সংকলন সিলেক্টেড শর্ট স্টোরিজ (১৯৯১)। 'ডাকঘর' (দ্য পোস্ট অফিস) বা 'তাসের দেশ' (কার্ড কান্ট্রি) নাটকের অনুবাদের কথাও কি আলাদা করে উল্লেখ করব না? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দুটি নাটকের অনুবাদই প্রকাশিত হয় ২০০৮ এ। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কাজটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে প্রকাশিত গীতাঞ্জলির অনুবাদ। রাদিচে তাঁর অনুবাদে যে শৈলীর ওপর নির্ভর করেন, তা গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিকে অনেকটাই মূলের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। তিনি কবিতাগুলিকে কবিতার আকারেই রাখলেন, শুধু তাই নয়, তিনি এই অনুবাদক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নতুন কবিতার নির্মাণ ঘটাতে চাইলেন যা মূল রবীন্দ্রকবিতাটির অনুসারী। এই কথাগুলো বলতে হচ্ছে কারণ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলির অনুবাদ করলেন, সেখানে তাঁর নির্মাণে এলো 'ভাবানুসারী গদ্যানুবাদ'। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে অন্ত্যমিল বা ছন্দের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কাব্যের ভাবটিকে গদ্যে পরিস্ফুট করলেন। এখানেই রাদিচে ও রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে তফাৎ ঘটে গেলো। এখন, অনুবাদেও মূল কবিতার কাব্যসুষমা সুরক্ষিত থাকবে, তাকে 'কবিতা' হয়ে উঠে হবে — এ তত্ত্বেরও দ্বিমত আছে। কোনও কোনও অনুবাদক বা প্রাবন্ধিকের মতে এ ভাবনা নিরর্থক। ফিরে আসি আবার উইলিয়াম রাদিচের

অনুবাদ প্রসঙ্গে। তাঁর আরেকটি সফল ও বহুনন্দিত অনুবাদকীর্তি হলো 'দ্য পোয়েম অব দ্য কিলিং অফ মেঘনাদ'। প্রকাশকাল ২০১০। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটি 'মেঘনাদবধ কাব্য'র অনুবাদ। আমরা আশ্চর্য হই এ কথা ভেবে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি কোন দক্ষতায় আত্মস্থ করেছিলেন যে তৎসম শব্দের ঐশ্বর্যে অলংকৃত ও সাধারণ্যে পাঠ-দুরূহতা সত্ত্বেও এই কাব্যের অনুবাদে রাদিচে পৌঁছে যান মূলের কাছাকাছি। আসলে রাদিচের অনুবাদ দর্শনেই রয়েছে মূল রচনার অনুসারী রূপান্তর, তিনি ছিলেন না ভাবানুবাদে ততটা বিশ্বাসী।

২

পুনরুক্তি হলেও এ কথার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক যে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অনুবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান বা কারিগরিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়সমূহের গবেষণা ও অনুশীলনের জন্য, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে সেই চর্চার বিস্তারে অনুবাদই হয়ে উঠতে পারে একমাত্র সোপান। সংস্কৃতির আদান প্রদানেও অনুবাদের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করতেই হবে। আর এখানেই আসে অনুবাদকের দর্শনের প্রসঙ্গটি। অর্থাৎ কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করে তিনি অনুবাদের অন্দরে প্রবেশ করছেন? স্বভাবতই এখানে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের অনুবাদকের মধ্যে চিন্তার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এ প্রসঙ্গে সচেতন ও ইতিহাসমনস্ক পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে বিতর্কটির কথা। ১৯৬১ সালে নাভানা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' গ্রন্থটি। ফরাসি ভাষাবিদ ও প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক চিন্ময় গুহ বলছেন, ''এমন ঘটনা বাংলা অনুবাদ-কবিতার জগতে সম্ভবত আর — একটিও ঘটেনি"। এই ফরাসি কবিকে বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচয় করানোর জন্য বুদ্ধদেব এই অনুবাদের কাজে 'পঞ্চাশের প্রান্তে এসে আয়ু ও স্বাস্থ্যের অনিশ্চয়তা জেনেও' নিজেকে একপ্রকার নিবেদন করেছিলেন। আবার এ কথাও বলেছিলেন,''সকলে জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান"। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এই অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠ করে চিন্ময় গুহর বিবমিষা জাগে। তিনি বলেন, ''অনুবাদকের বিশেষ ধরনের শব্দবন্ধ এবং বোদল্যেরীয় অশুভ, অসুন্দরের সচেতনতা মিলে এই প্রবল বিতৃষ্ণা তৈরি করে থাকবে"। তিনি আরও বলেছেন কবির মূল রচনাটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে 'সহজ অনুপম সৌন্দর্যের ভগ্নাংশও কেন বুদ্ধদেবের অনুবাদে নেই'। বাংলা কাব্যজগতের জ্যোতিষ্ক অরুণ মিত্রও ষাটের দশকে লেখা একটি প্রবন্ধে বলেছেন বুদ্ধদেব কৃত বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে। সেখানে তিনিও দেখিয়েছেন মূল থেকে কীভাবে চ্যুত হয়েছে অনুবাদের কবিতাটি। এখানেই আসে অনুবাদের দর্শন আর তা' থেকে উদ্ভূত অনুবাদতত্ত্ব বা চর্চার প্রসঙ্গটি। যে বিষয়টি হয়ে উঠলো এবারের সংখ্যার ভরকেন্দ্র। অনুবাদতত্ত্ব বা অনুবাদচর্চা নিয়ে কথা বলতে গেলে এরকম বহু প্রসঙ্গই আলোচনায় উঠে আসে। সেই আলোচনাই বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে 'অন্যলেখ'র এবারের সংখ্যায়।

অনুবাদতত্ত্ব নিয়ে যেমন রচিত হয়েছে প্রবন্ধ, তেমনই বিভিন্ন প্রবন্ধে এসেছে বিভিন্ন দেশ ও ভাষার সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদের প্রসঙ্গ। শুধু কি বাংলায়? সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন সত্যজিৎ রায় সহ বেশ কয়েকজন অনুবাদক। 'আবোল তাবোল'-এর অন্ত্যমিল ও স্বরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিব্যঞ্জনা কীভাবে রূপান্তরে পাচ্ছেন ইংরেজি-সাহিত্য-পাঠক, কীভাবে অনুবাদকের মন ও প্রজ্ঞা কাজ করলো বা প্রতিফলিত হলো তাঁদের স্বীয় স্বীয় অনুবাদকর্মের মধ্যে, তা' নিয়ে রয়েছে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ।

৩

ভাবানুবাদ ও মূল রচনার বিচ্যুতিতে যতটা অভিযুক্ত হন সাহিত্যের অনুবাদক, ততটা বোধ হয় ঘটে না বিজ্ঞান বা অন্য বিষয়ের অনুবাদের ক্ষেত্রটিতে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের অনুবাদ পরিভাষার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। পর্যাপ্ত পরিভাষার অপ্রতুলতা ও বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটির ব্যাপ্তি ও তার বাস্তবতা ও অবাস্তবতা নিয়ে যে তার্কিক প্রতিবেশ, তা তো বহু পুরোনো। বিজ্ঞানের অনুবাদ বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হলেও, তা' অবশ্য পরিভাষাকেন্দ্রিক নয়। পাঠকের আগ্রহ জিইয়ে রাখার জন্য বিষয়ভাবনাগুলি বরং উহ্যই থাক!

৪

নাটকের অনুবাদের ক্ষেত্রে অবশ্য চিত্রটি কিছুটা আলাদা। এখানে যে বাংলায় অনূদিত নাটকের কথা বলছি, তার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। নাটক অনুবাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আরও দুটি শব্দ, 'রূপান্তর' ও 'স্থানীয়করণ'। কোনও কোনও নাট্যবিদ মনে করেন অনুবাদের সঙ্গে রূপান্তর শব্দটিকে জড়িয়ে নেওয়া যায় না। যায় না কারণ, এক শিল্পমাধ্যম থেকে অন্য শিল্পমাধ্যমে যখন গল্পটি বা বিষয়টি বা ঘটনাটি রূপান্তরিত হয়, তখনই কেবল তা 'রূপান্তর' আখ্যা পেতে পারে। যেমন একটি নাটকের সিনেমায় রূপান্তর অথবা গল্প বা উপন্যাসের সিনেমায় কিংবা নাটকে রূপান্তর। আর 'স্থানীয়করণ'-কে আরও সহজে বোঝাতে গেলে বলতে হয় বঙ্গীকরণ। এই কাজটি সবচেয়ে বেশি করেছিলেন প্রখ্যাত নাটককার নির্দেশক অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধরা যাক, মূল নাটকটির বা টেক্সটির পটভূমি বিদেশের কোনও শহর বা অঞ্চল। এবার মূল ঘটনাটিকে এনে ফেলা হলো এ রাজ্যের কোনও শহরে বা গ্রামে বা অন্য কোথাও। সেখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, স্থান, কাল, চরিত্র ইত্যাদির প্রেক্ষিতে নাটকটিকে নতুন করে লেখা হলো। মৌলিক কাঠামো বা ঘটনাটি কিন্তু একই রইলো। নাটক যেহেতু প্রদর্শশিল্প, তাই সেখানে দর্শকের ভূমিকাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্থানীকৃত নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে দর্শকের মনে হতে থাকে, ঘটনাটি এই মুহূর্তে এখানেই ঘটছে। তবে অনূদিত নাটক কি একেবারে অভিনয় হয় না? অবশ্যই হয়, যদিও স্থানীকৃত নাটকের তুলনায় কম। এ ব্যাপারে সবথেকে উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন শেক্সপিয়ার। তাঁর নাটকে অনুবাদ যেমন অভিনীত হয়েছে বা হচ্ছে, তেমনই স্থানীকৃত টেক্সটের অভিনয়ও যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে চলেছে। গ্রুপ থিয়েটারে প্রথম বঙ্গীকৃত নাট্যের অভিনয় মঞ্চে নিয়ে এলেন শম্ভু মিত্র ইবসেনের 'এনিমি অফ দ্য পিপল' অবলম্বনে 'দশচক্র' নাটকের মধ্যে দিয়ে। নাটকে অনুবাদচর্চা কীভাবে এগিয়েছে তার একটা হদিস পাঠক পাবেন অনুবাদনাট্যে অজিতেশের ভূমিকা বিষয়ক একটি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে।

৫

এই সংখ্যার ক্রোড়পত্রের বিষয় ''পিকাসো''। প্রখ্যাত চিত্রকর পাবলো পিকাসো। তবে চিত্রশিল্পী পিকাসো নয়, এই ক্রোড়পত্রে আমরা এক অন্য পিকাসোকে পাঠকের সামনে নিয়ে আসতে চেয়েছি, যে পিকাসো কাব্যচর্চার, যে পিকাসো নাট্যচর্চার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৪১-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই পিকাসো সৃষ্টি করেন তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি গোর্নিকা। ফ্রান্সে তখন নাৎসির আধিপত্য। পিকাসো যখন তাঁর স্বদেশ ছেড়ে আসছেন প্যারিসে, তখন তাঁর সঙ্গী হয়ে উঠছেন গিয়োম আপলোনিয়ের, পল এল্যুয়ার, আঁদ্রে ব্রেতো, লুই আরাগোঁ, জাঁ ককতো প্রমুখ কবিবৃন্দ। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৩ অবধি পিকাসো সাহিত্যচর্চায় মগ্ন থেকেছেন। এই সময় লিখেছেন তিনশোর ওপর কবিতা এবং দুটি নাটক। ১৯৪১-এ ১৪ থেকে ১৭

জানুয়ারি — মাত্র এই তিনদিনে লিখলেন প্রথম নাটকটি। আর দ্বিতীয়টি লেখা শুরু হলো বেশ কয়েকবছর পরে, ১৯৪৭-এ। নভেম্বরের ২৪ তারিখে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৪৮ সালের ১৩ অগাস্ট। প্রথম নাটক যার ইংরেজি নাম 'ডিজায়ার কট বাই দি টেল' ১৯৪১-এ রচিত হলেও ১৯৪৪ সালে হয় তার শ্রুতি অভিনয়। এই অভিনয়টির প্রযোজক ও পরিচালক ছিলেন আলবেয়ার কাম্যু। দ্বিতীয়টি যার ইংরেজি নাম 'দ্য ফোর লিটল গার্লস' ১৯৪৮-এ পিকাসো রচনা করলেও পরে ১৯৫২-তে পুনর্লিখন করেন। কবিতা ও নাটকের মধ্যে দিয়ে পাঠকের সমীপে এসে দাঁড়ান যে পিকাসো, যিনি ততটা পরিচিত নন কবি ও নাটককার হিসেবে, সেই পিকাসোকেই উপস্থাপন করা হলো এবারের ক্রোড়পত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবিতাগুলো ইংরেজি থেকে অনূদিত হলেও নাটক দুটি কিন্তু অনূদিত হয়েছে সরাসরি ফরাসি ভাষা থেকে। পিকাসোর এই দুটি নাটকের অনুবাদ আগেও হয়েছে, যদিও সেই অনুবাদগুলি সম্ভবত ইংরেজি থেকেই হয়েছে। মূল ফরাসি থেকে আগে কখনও নাটকদুটি অনূদিত হয়েছে কিনা সে সংক্রান্ত কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই।

৬

এই সংখ্যা থেকে একটি নতুন বিভাগ চালু করছি, তা' হলো অন্যলেখ বক্তৃতামালা। প্রথম বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন বিশিষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়। সেই বক্তৃতার লেখ্যরূপটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হলো। প্রসঙ্গত জানাই বক্তৃতার বিষয় ছিল ''ছোট পত্রিকা কি প্রকৃত অর্থেই অপ্রাতিষ্ঠানিক?" আরও জানাবার, যেহেতু এই সংখ্যার বিষয় অনুবাদচর্চা, তাই এবারে গ্রন্থসমালোচনার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে একটি অনুবাদ গ্রন্থকেই। গ্রন্থটি মূল ফরাসি থেকে বাংলায় অনূদিত। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাঠক আলোচ্য প্রবন্ধটিতে পাবেন।

৭

জীবনানন্দ দাশ ও কাজী নজরুল ইসলাম — বঙ্গমননে গভীর অভিঘাত সৃষ্টিকারী এই দুই কবির একশো পঁচিশ জন্মবর্ষটি সাড়ম্বরে পালিত হলো এবং এখনও হয়ে চলেছে। প্রথমজন যদি হয়ে থাকেন রবীন্দ্রপরবর্তী সময়ের সর্বাপেক্ষা আলোচিত ও প্রভাবসৃষ্টিকারী কবি, তবে দ্বিতীয়জন আপামর বাঙালির আবেগের প্রতিভূ। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ও পরবর্তীতেও, বিশেষ করে সংকটে ও সংগ্রামে নজরুলের কবিতায়, নজরুলের গানে উজ্জীবনের মন্ত্রে আন্দোলিত হয়েছে বাঙালির প্রাণ। আবার রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা আধুনিক কবিতার যে গমনপথ, সেখানে জীবনানন্দ অগ্রপথিকের ভূমিকাটি পালন করেছেন তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে। তার মানে কি জীবনানন্দকে অনুসরণ করেছেন পরবর্তী কবিরা ? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তাঁদের কাব্যচর্চায় কবিতানির্মাণে জীবনানন্দের কবিতা তাঁদের ভাবিয়েছে, কবিতার বাঁকবদলে জীবনানন্দ আলোকশিখাটির মতো সমুজ্জ্বল থেকেছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে সঞ্চারমান এই দুই কবিকে অন্যলেখ পত্রিকার পক্ষ থেকে জানাই অন্তরের প্রণাম।

৮

বিগত বছরটি জুড়ে এছাড়াও পালিত হলো প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর জন্মশতবর্ষ। ১৯৪৬-এ পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'আদাব' গল্পের শিঙ্গাটি বাজিয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্দরে যাঁর আগমন ঘোষিত হলো, দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর পেরিয়ে ১৯৮৮-তে হঠাৎই তা' স্তব্ধ হয়ে যায় 'দেখি নাই ফিরে' (অসমাপ্ত) উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। 'উত্তরঙ্গ', 'বি টি রোডের ধারে', 'গঙ্গা' পেরিয়ে 'বিবর' ও 'প্রজাপতি'র সরগরম

বিতর্কের অধ্যায় কিংবা শেষ পর্বের উপন্যাসমালা অথবা কালকূটের কলমে 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাবো তারে', 'শাম্ব', 'দেখি নাই ফিরে' ইত্যাদি রচনাপুঞ্জের মধ্যে দিয়ে যে সাতরঙা জীবন সমরেশ যাপন করেছিলেন মাত্র চৌষট্টি বছরের জীবনে, তা' সাহিত্যমনস্ক পাঠককে আলাদা করে মনে করানোর হয়তো প্রয়োজন পড়ে না। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশও নেই। বরং আমরা নীরবে গভীর শ্রদ্ধায় অন্তরের প্রণাম নিবেদন করি আশ্চর্য এই কথাসাহিত্যিককে।

জন্মদিনের প্রসঙ্গ যখন এলো, তখন কয়েকজন কিংবদন্তি নাট্যশিল্পীর কথা উল্লেখ করা যাক যাঁরা শতবর্ষ স্পর্শ করলেন বা সদ্য অতিক্রম করলেন। তাঁরা হলেন তাপস সেন, বাদল সরকার, তৃপ্তি মিত্র মিত্র। প্রবাদপ্রতিম এই তিন নাট্যব্যক্তিত্বের প্রতিও রইলো আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

৯

গত এক বছরে ক্ষত ও ক্ষতির পরিমাণ মোটেই কম নয়; বিশেষ করে যাঁরা এই লোক ছেড়ে পাড়ি দিলেন অন্য কোথা অন্য কোনোখানে, তাঁদের শূন্যতা তো সহজে পূর্ণ হবার নয়। এ বছর সেই তালিকা বেশ কিছুটা দীর্ঘ। গভীর বেদনাকে সাথী করেই নত হই সেই সব প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের সম্মুখে। ক্ষতির মুখোমুখি যেমন আমরা হয়েছি, তেমনই পরিবেশ, সমাজ ও পরিপার্শ্ব গভীর ক্ষতের সৃষ্টি কি করেনি বঙ্গমানসে? বৃহৎ বাঙালির যে অহংকার অলংকার হয়ে ছিল একদা, আজ কি তা' শুধুই স্মৃতিবিলাস? সব প্রশ্নের চটজলদি উত্তর হয় না, বরং আসুন নতুন বছরে নতুন করে ভালো থাকার রসদ খুঁজে নিই সাহিত্য আর সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে থেকে। নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক, ভালো থাকুন।